অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হানাহানি, রক্তপাত অর্থাৎ সকল প্রকার অশান্তির উৎস বর্তমানের প্রচলিত সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থা। সুতরাং

আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

রাস্তা যদি বাঁকা হয় শত চেষ্টাতেও গাড়ি সোজা চালানো যাবে না

হেযবুত তওহীদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বর্তমানে আমরা এক ভয়াবহ দুঃসময় অতিক্রম কোরছি। সামাজিক অন্যায়, নেতৃবৃন্দের অসততা, অঙ্গীকারভঙ্গ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, হানাহানি ইত্যাদির মধ্যে মানবজাতি নিমজ্জিত হোয়ে আছে। আমরা মনে করি এই অবস্থাটি সৃষ্টির পেছনে কেবল কোন একক ব্যক্তি বা দল দায়ী নয়, **প্রধানত দায়ী হোচ্ছে আমাদের সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থা।** সেটা কিভাবে?

আল্লাহর রসুল বলেন, প্রত্যেক মানবশিশু জন্ম নেয় ফেতরাতের (প্রকৃতির) উপর, অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা যরোথুস্ট্রিয়ান (অগ্নিপূজক) বানিয়ে ফেলে [আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী]। পরিবার একটি সিস্টেম। এই সিস্টেমের প্রভাবে পরিবার থেকে যেভাবে মানুষের ধর্মনির্ধারণ হয়, ঠিক তেমনি সমাজব্যবস্থাও মানুষকে নিজস্ব কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তোলে। সমাজব্যবস্থা যদি বস্তুবাদী, ভোগবাদী হয়, মানুষও হবে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, মানুষগুলিও ধীরে ধীরে হবে দুর্নীতিগ্রস্ত। পক্ষান্তরে সমাজব্যবস্থা যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, মানুষগুলিও হবে ন্যায়নিষ্ঠ। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদা মাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ডাইসের (Mould, ছাঁচ) মধ্যে ফেলা হবে, কাদা মাটি সেই ডাইসের রূপ, আকৃতি ধারণ কোরবে। সমাজব্যবস্থাও এমনই একটি ডাইস। কখনও কোন মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হোয়ে, ডাকাত হোয়ে, অন্যায়কারী, দুর্নীতিবাজ হোয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে ধীরে ধীরে তারা এমন অপরাধী চরিত্রের হোয়ে যায়। যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে চাকরি কোরতে যান তাদের অনেকেই এই অভিপ্রায় নিয়ে যান না যে ইচ্ছা মতো ঘুষ খাবেন, বরং সৎ জীবনযাপনের ইচ্ছা নিয়েই যান চাকুরিতে। কিন্তু সিস্টেমই তাদের অধিকাংশকে ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অসৎ বানিয়ে ফেলে। তারা এমন পরিস্থিতির শিকার হন যে অসৎ না হোয়ে তাদের কোন উপায় থাকে না।

যারা ব্যবসা কোরতে যান তারা অনেকেই হয়তো এই নিয়তে যান না যে তিনি মাপে কম দিবেন, ভেজাল মেশাবেন; কিন্তু এক সময় তাকে বাজারে টিকে থাকার জন্য অন্যদের মতই সততা বিসর্জন দিতে হয়। রাজনীতিতে যারা যান তারাও হয়তো এই মানসিকতা নিয়ে যান না যে দুর্নীতি

কোরবেন, সন্ত্রাসী লালন কোরবেন, জনগণের সম্পদ লুট কোরবেন, বিদেশে টাকা পাচার কোরবেন। এমন কি অনেকের হয়তো জনসেবা করার ইচ্ছাও থাকে কিন্তু পরে তাদের কী অবস্থা হয় সেটা সকলেরই জানা। **প্রশ্ন হোল, কেন মানুষগুলো ধীরে ধীরে তার নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে? কেন তারা সততা হারিয়ে দুর্নীতিবাজ, ওয়াদা খেলাফকারী হয়ে যায়, সন্ত্রাসী, মিথ্যাবাদী, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনকারী হোয়ে যায়?**

যে ছাত্ররা শিক্ষাগুরুর পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নিত, শ্রদ্ধা জানাতো, শিক্ষককে দেবতুল্য জ্ঞান কোরত, সেই ছাত্ররাই এখন কেন শিক্ষককে আটক কোরে রাখে, মারধোর করে? যে ছাত্রদের শিক্ষা অর্জন কোরে মানবসেবার জন্য আত্মনিয়োগ করার কথা, সেই ছাত্ররা টেন্ডারবাজী করে, সন্ত্রাসী করে, বোমাবাজি করে, ছাত্রাবাসের আধিপত্য নিয়ে পরস্পরকে খুন করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী হিসাবে ভাড়া খাটে। এর প্রকৃত কারণ হোচ্ছে, সিস্টেমই তাদেরকে এমন বানায়। কোন চালক যদি চেষ্টা করে একটা গাড়িকে সোজা চালাতে, কিন্তু রাস্তাটা যদি বাঁকা হয় তবে সে শত ইচ্ছা কোরেও সোজা চালাতে পারবে না। চালাতে গেলে সে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। একইভাবে যদি রাস্তা সোজা থাকে তাহলে সে চাইলেও আঁকা-বাঁকা হোয়ে চোলতে পারবে না, রাস্তাই তাকে সোজা চোলতে বাধ্য কোরবে।

এই রাস্তা হোচ্ছে একটি সিস্টেম যা মানুষের জীবনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই হয়তো অন্যায় কোরতে চায় না। কিন্তু সিস্টেমের কারণে তারা অন্যায় কোরতে বাধ্য হোচ্ছে। আপনি শত চাইলেও ভাল থাকতে বা ভালো কোরতে পারবেন না। **সিস্টেমের যাঁতাকলে পড়ে আপনার চরিত্রের সব সৎগুণাবলী ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে।**

হ্যাঁ, মানুষ আন্তরিকভাবে চাচ্ছে শান্তি আসুক; কেবল চাচ্ছেই না, তারা প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সারা পৃথিবীতে মসজিদে, মন্দিরে, চার্চে, সিনাগগে ধার্মিক লোকেরা প্রার্থনা কোরে যাচ্ছেন। শান্তির জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হোয়েছে, বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হোয়েছে, নতুন নতুন নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরী করা হোয়েছে, তাদেরকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সমৃদ্ধ করা হোয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় এসব বাহিনীর সদস্যগণ সারারাত দায়িত্ব পালন করেন, গাড়ীতে ঘুমান। কিন্তু তবুও আইন-শৃঙ্খলার

দিন দিন অবনতিই হোচ্ছে। অন্যায় অবিচার দিনকে দিন বাড়ছে। অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার শপথ নিচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই চায় না যে দেশের মানুষ অশান্তিতে থাকুক, ভেজাল থাক - খাবারের সাথে বিষ থাক, জনগণের সম্পত্তি চুরি ডাকাতি হোক, মানুষ খুন হোক, ডোবা নালায় তাদের লাশ পড়ে থাকুক। হয়তো কোন সরকারই চায় না এসব ঘটুক। তা সত্ত্বেও এগুলিই ঘটে। **আর এই অন্যায়গুলি হোচ্ছে সিস্টেমের কারণে।**

এ কেমন সমাজ ব্যবস্থা আমরা কায়েম কোরলাম? কৃষক কষ্ট কোরে ফসল ফলায় কিন্তু সিস্টেমের মারপ্যাঁচে পড়ে ন্যায্যমূল্য পায় না, অন্যদিকে মধ্যসত্ত্বভোগীরা দিনকেদিন ফুলেফেঁপে ওঠে। অতি কষ্ট করে কয়েকশ টাকা রোজগার কোরলেন, পটেকমার পকেট কেটে নিয়ে যেতে পারে। যখন তখন ছিনতাই হোতে পারে। শেয়ার বাজারে টাকা খাটাবেন? যখন তখন গায়েব হোয়ে যেতে পারে। ব্যবসা কোরবেন, বিভিন্ন কায়েদার চাঁদাবাজ এসে হয়তো মূলধন গায়েব কোরে দেবে। অসুখ হোলে যে ঔষধ খাবেন সেটাও ভেজাল। নিজের পাওনা পেনশন আনতে যাবেন অফিসে, ঘুষ না দিলে পেনশন বন্ধ। দোকান থেকে এক কেজি গোশত কিনে বাসায় এনে দেখবেন দুইশ গ্রাম নেই। মাছ, তরকারি, আম, কাঁঠাল, কমলা যা খাবেন সবকিছুতেই বিষ, ফরমালিন আর কার্বাইড মেশানো। টিভি খুলবেন দেখবেন অশ্লীল দৃশ্যের ছড়াছড়ি। ছেলে-মেয়েদেরকে যতই লেখা পড়া শেখাচ্ছেন ততই যেন তারা অবাধ্য ও আদব-কায়দাহীন হোয়ে যাচ্ছে। মেয়েকে পাঠিয়েছেন শিক্ষকের কাছে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কে জানে তার কি পরিণতি হয়। এভাবে ক্রমাগত আতংক আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আর কতকাল বসবাস কোরবেন? এই অবস্থার জন্য কাকে দোষ দেবেন, সরকারকে? আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে? রাজনীতিকদের? ব্যবসায়ীদের? শ্রমিকদের? ছাত্রদের? গণমাধ্যম কর্মীদের? সবার সঙ্গে কথা বলেন, দেখবেন সকলের এক উত্তর- 'কি করবো ভাই, আমরা তো পরিস্থিতির শিকার!' হ্যাঁ, দায়ী আমরা সবাই। একদিনে হঠাৎ কোরে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। **আমরা যখন বৃটিশ খ্রিস্টানদের গোলাম ছিলাম তখন থেকেই তারা আমাদের উপর আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী এক সিস্টেম চাপিয়ে দিয়েছে।** ভৌগোলিকভাবে বর্তমানে স্বাধীন হোলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে এখনও তারাই আমাদের প্রভু। সেই থেকে আজও তাদের দেওয়া সিস্টেমে আমাদের সবকিছু চোলছে। এই সিস্টেমে বাস কোরে কেউ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভাল হতে পারবে না; কোনভাবে আইন শৃঙ্খলার

উন্নতি ঘটানো যাবে না; ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট ইত্যাদি ঠেকানো যাবে না। বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরও ভায়াবহ ও জটিল আকার ধারণ কোরবে।

প্রচলিত সিস্টেম অনুসরণ কোরে হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, বিক্ষোভ, অনশন ইত্যাদি করা হয় ন্যায্য অধিকার ও দাবী আদায়ের জন্য। ঐ সমস্ত কোরে কবে কতটুকু দাবি আদায় হয় তা সকলেরই জানা, এসব কর্মসূচী পালন কোরতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয় সহিংসতা, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও, অগ্নিসংযোগ, দিনশেষে আহত এতজন, নিহত এতজন--এই হোল তাৎক্ষণিক ফল; আর সুদূরপ্রসারী ফল হোচ্ছে জাতির মধ্যে অনৈক্য, অসন্তোষ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিশৃঙ্খলা- এক কথায় ভয়াবহ বিভীষিকা।

একদলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অন্যদলের ভোটের বাক্স ভরে দিচ্ছে জনতা, যাদেরকে নির্বাচিত কোরল তারাও পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাস লালনকারী, বিদেশে অর্থপাচারকারী, ওয়াদাভঙ্গকারী। যাদেরকে পরাজিত কোরল তারাও এদেরই মতো। এই ক্ষমতার লড়াইতে কত প্রাণ গেল, কত রক্ত ঝোরল, কত গাড়ি-বাড়ি পুড়লো, কত মানুষ পঙ্গু হোল, কতজন অন্যায়ভাবে জেলে পঁচলো। এসব কোরে সাধারণ মানুষ কি পেল? এ যেন বাঁচার জন্য কড়াই থেকে লাফ দিয়ে চুলোয় পড়া, আর চুলো থেকে উঠে আবার কড়াইতে পড়া। এটাতো সুদূর কোন অতীত নয়, এতো নিকট অতীত কিভাবে আমরা ভুলে যাচ্ছি? এই যে নির্বাচনের সংস্কৃতি (Power Game), এ থেকে কি আমরা একবার বেরিয়ে আসতে পারি না? **সকলকে বোঝা উচিৎ গণতন্ত্রের নামে এক বিষাক্ত, জীবনঘাতি সিস্টেম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হোয়েছে।** যে সিস্টেমে একজন সৎ, যোগ্য, প্রকৃত ওয়াদা রক্ষাকারী, আমানতদার, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী কখনোই উঠে আসতে পারবে না; এই সিস্টেমে যে যত বেশি অপপ্রচার চালাতে পারে, মিথ্যা প্রচার কোরতে পারে, কালো টাকা ছড়াতে পারে, পেশীশক্তি ব্যবহার কোরতে পারে সে নির্বাচিত হয়। সে যত বড় দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, ওয়াদা খেলাফকারী, দেশের সম্পদ লুন্ঠনকারী, সন্ত্রাস লালনকারী হোক না কেন কোন অসুবিধা নাই।

প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচনে প্রথমে একজন টাকা দিয়ে মনোনয়ন পত্র কিনে প্রার্থী হয়, নিজের ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপায়, নিজের গুণগান নিজেই প্রচার করে, মিছিল করে, ব্যানার টানায়, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, মানুষকে তার পক্ষে নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, প্রয়োজনে প্রতিপক্ষকে

খুন করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। নিয়মিত শান্তি শৃঙ্খলা বাহিনী তো আছেই, নির্বাচনের কেন্দ্র এবং ভোটের বাক্স পাহারা দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীও মোতায়েন কোরতে হয়। পাহারা উঠিয়ে নিলেই বোঝা যায় কে কতটা সভ্য। তখন বোমা মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি কোরে ভোটকেন্দ্র দখল, ভোটবাক্স লুট ইত্যাদি অনেক কিছুই ঘটে। গ্রাম্য মেম্বার থেকে শুরু কোরে যে কোন পর্যায়ের নির্বাচনেই এসব ঘটনা ঘোটে থাকে। এটাই নেতা নির্বাচনের বর্তমান সিস্টেম, সারা দুনিয়াতে এই সিস্টেম প্রায় একই রকম, শুধু কোথাও সহিংসতা কম, কোথাও বেশী। যারা নেতা নির্বাচিত হন তাদের ১০০% ই খারাপ তা অবশ্য নয়, কিছু কিছু ভাল মানুষও যদি কালে ভদ্রে নেতা হন, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আর তারাও বেশীদিন তাদের সচ্চরিত্র ধোরে রাখতে পারেন না; **সিস্টেমটাই এমনভাবে তৈরী যে, কেউ ভালো থাকতে চাইলেই ভালো থাকতে পারেন না।**

সর্বোপরি প্রশ্ন হোল- এই সব কোরে কী পেয়েছে জনতা? সেই তো অবহেলা, বঞ্চনা, দুর্ভোগ দিনকে দিন আরও বাড়ছে। এই জীবন ব্যবস্থা বা সিস্টেম এর মধ্যে যতদিন থাকবেন ততোদিন কোনো মুক্তি নাই।

আমাদের সমাজে একটি কথা চালু আছে, আগে নিজে ভালো হোন, তারপর দেখবেন সব ঠিক হোয়ে গেছে। এই কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ একটি জীবনব্যবস্থায় মানুষের সামষ্টিক জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। ব্যক্তি কখনও সামষ্টিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে পথ চোলতে পারে না। জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনের চাপে ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। বিশাল এক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি যমুনা নদীর তুলনায় এক টুকরো শোলার মতো। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, সেটা দ্বারা ব্যক্তিও কমবেশী প্রভাবিত হোতে বাধ্য। কাজেই জাতীয়ভাবে আজ আমাদের এমন একটি সিস্টেম দরকার যেখানে শত চেষ্টা কোরেও কেউ ঘুষ খেতে পারবে না, অন্যায় কোরতে পারবে না, ওয়াদা খেলাফ কোরতে পারবে না; কেউ বিপুল সম্পদের মালিক হবে আর কেউ না খেয়ে রাস্তায় ঘুমাবে এমন অবিচার সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাও যেখানে থাকবে না। এজন্য আমাদের এই সিস্টেমকে পাল্টাতে হবে। প্রশ্ন হোল, এমন সিস্টেম কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তর হোল, **স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক, সত্য জীবনব্যবস্থাই হোচ্ছে সেই সিস্টেম। মানুষ নামক এই প্রাণী সৃষ্টি কোরেছেন আল্লাহ, কাজেই কোন রাস্তায় বা**

সিস্টেম-এ সে সুখে থাকবে সেটা ভালো জানেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই হোচ্ছে সরল পথ, কাজেই এর নামই আল্লাহ রেখেছেন সেরাতুল মোস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ।

আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় সেই প্রকৃত, অবিকৃত এসলাম আবার হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রকৃত এসলামের যে রুপরেখা অঙ্কন কোরে গেছেন, আমরা যদি সে মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত কোরি, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনে পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারবো। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে তওহীদ ও জেহাদ-বিহীন, শুধুই ব্যক্তিগত কিছু আমলসর্বস্ব বিকৃত বিপরীতমুখী যে এসলামটা দুনিয়াতে চালু আছে আমরা সেই এসলামের কথা বোলছি না। আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম মহানবী যেভাবে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন সেটি গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হোতে হোতে বর্তমানে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। তথাকথিত আলেম শ্রেণী এই বিকৃত এসলামটিকে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। একদা লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী আজ ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়ে আছে; আরেকটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়। কেননা এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ যারা এসলামের অনুসারী হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। আমরা হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রহমে সেই প্রকৃত এসলাম মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ কোরেছি।

মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন রকম জীবনব্যবস্থা একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হোয়ে গেছে। দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর প্রত্যেকটাই ব্যর্থ হোয়েছে। এখন অধিকাংশ রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা

চোলছে। এর ফলও আমরা দেখছি। পৃথিবী বর্তমানে গত এক বা দুই শতাব্দী আগের চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় এবং অবিচারে পূর্ণ। গরীব ও ধনীর ব্যবধান অনেক বেশী প্রকট। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত বহুগুণে বেশী। গত এক শতাব্দীতেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে কোটি কোটি লোক হতাহত হোয়েছে। এই নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের একটি দিনও যায় নাই যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ, রক্তপাত চলে নাই। মানব জাতির এই সঙ্কটকালে আমরা হেযবুত তওহীদ এই ডাক দিচ্ছি যে, সবগুলি জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার পর স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন পথ নেই। শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হোচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। আল্লাহর সত্যদীন মানুষকে ১৪০০ বছর আগে যে শান্তিময় জীবন উপহার দিয়েছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত যে সমাজ উপহার দিতে সক্ষম তার সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হোল।

১. বিচার ব্যবস্থা:

বিচারক আল্লাহর বিধান অর্থাৎ কোর'আন ও রসুলের সুন্নাহ দেখে রায় দিতেন। সুতরাং তিনি যে সিদ্ধান্ত দিতেন তা ছিল স্বয়ং আল্লাহর সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ নির্ভুল। তাই বাদী ও বিবাদী উভয়ই সেই বিচার সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কোন বাহিনী ছিল না, মাসের পর মাস অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আদালতে আসতো না। সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধ প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল। কালেভদ্রে রিপুর বশবর্তী হোয়ে কেউ অপরাধ সংঘটন কোরে ফেললে সে নিদারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হোত এবং নিজের পাপের সাজা দুনিয়াতে ভোগ কোরে আল্লাহর কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইতো। বহুক্ষেত্রে সাক্ষীর কোন দরকারই হোত না, অপরাধী নিজেই বিচারকের কাছে এসে তার অপরাধ স্বীকার কোরে শাস্তি প্রার্থনা কোরত; আর উকিলেরও কোন প্রয়োজন হোত না। সুতরাং ন্যায়বিচার পেতে কারও অর্থব্যয় কোরতে হোত না। শুধু বিচারের আশায় বছরের পর বছর ঘুরে ভিটে মাটি হারাতে হোত না। বিচারকের রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রায়ের বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, ভাঙ্গচুর, হরতাল, আদালতে হামলা এসব তো ছিল কল্পনারও অতীত।

২. শাসক শ্রেণী:

শাসক শ্রেণী থাকবেন জনগণের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর বিধানমতে দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও একজন থাকবেন দায়িত্বশীল বা আমীর। সুতরাং কোন একজন ব্যক্তিও কখনও নিজেকে অবহেলিত বা উপেক্ষিত ভাবতে পারবে না। সর্বদাই তার একজন দায়িত্বশীল থাকবেন যিনি নেতৃত্বের ক্রমধারা (Chain of command) অনুযায়ী জাতির প্রধান পরিচালকের (এমাম) নিয়ন্ত্রণাধীন। শাসক হিসাবে তারা একজন নাগরিকের চেয়ে বাড়তি কোন সুবিধাই ভোগ কোরবেন না। তাদের জীবনযাপন হবে সাধারণ মানুষেরই মত, তাই সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে তাদের কোনই অসুবিধা হবে না।

আল্লাহর ব্যবস্থা দিয়ে মানবজাতিকে শাসন করাই মানুষের প্রকৃত এবাদত, এজন্য শাসকগণ হবেন আল্লাহর সবচেয়ে বড় এবাদতকারী। তারা জনগণকে ভালোবাসবেন, জনগণও তাদের শাসকদেরকে ভালবাসবে। রাষ্ট্রের সম্পদকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত কোরবেন না, একে তারা জনগণের পবিত্র আমানত হিসাবে রক্ষা কোরবেন। তারা নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে এনে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পুঞ্জিভূত কোরবেন না। বর্তমানের অধিকাংশ শাসকই জানেন যে, জনগণের মনে তাদের জন্য ভালবাসা নেই। তাই নিজেকে তারা কখনওই নিরাপদ ভাবতে পারেন না, দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ বিদেশের ব্যাংকে পাচার কোরে সুযোগের অপেক্ষা কোরতে থাকেন। বিদেশের মাটিতে আলিশান বাড়িঘর বানিয়ে রাখেন। দেশের পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ দেখলেই উড়াল দেন বিদেশে। আবার ক্ষমতায় থাকা কালে নিজ দেশের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল কোরতে ডেকে আনেন শক্তিশালী বন্ধুরাষ্ট্রগুলিকে (!), অনেকটা মহল্লার মাস্তান ডাকার মত।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা:

শেষ রসুলের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্যকরী করার ফল কী হোয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা আমাদের এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ কোরছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা কোরুন। কল্পনা কোরুন সেই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরী কোরতে কোন বাধা নেই, কোন

লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরী কোরে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে না। সেই সমাজে কোন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিস বাহিনী নেই। বর্তমানের মত হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোন জেলখানাও সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলিতে দুই চারজন লোক রাখার মত ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বোলতে গেলে কোন অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলিতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত। আমরা জানি, এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমাদের আরজ হোচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা কোরতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু কোরে এই জাতির আদর্শচ্যুতি ও ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধোরে এই অবস্থা বিরাজ কোরেছিল। **এই অকল্পনীয় অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হোয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানব রচিত সকল ব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান কোরে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ কোরেছিল অর্থাৎ 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান গ্রহণ কোরি না' এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা কোরেছিল।** মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা এতদূর গিয়েছিল যে, একজন সুন্দরী যুবতী সারাদেহে মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় একা শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম কোরত, তার মনে কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা জাগ্রত হোত না। রাস্তায় মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে গেলেও তা খুঁজে পাওয়া যেত, কেউ সেটা তসরুপ কোরত না। মানুষ ঘরে তালা না দিয়ে চোলে গেলেও ফিরে এসে সব যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই পেত। সালাহ কায়েমের সময় মানুষ স্বর্ণালঙ্কারের দোকান একদম খোলা রেখেই মসজিদে যেত, কেউ কিছু চুরি কোরত না।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে মসজিদের ভিতর থেকেও জুতা চুরি হয় অহরহ; মাইক, ফ্যান ইত্যাদিও সেখানে নিরাপদ নয়। ছিনতাই, অপহরণ, হত্যা, গুম, ডাকাতি, ধর্ষণসহ সর্বরকম অপরাধে আমাদের এই সমাজ কানায় কানায় পূর্ণ। প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি মানুষ নিজ ও নিজের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। ভিক্ষুকের থালা থেকেও পয়সা চুরি হয়, শাসকরাও শত শত দেহরক্ষী, নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও সর্বদা আতঙ্কে ভোগেন। এই অনিরাপদ পরিবেশ প্রচলিত সিস্টেমের বিষময় ফল।

৪. অর্থনৈতিক সুবিচার:

সুদ ভিত্তিক পূঁজিবাদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে আজ মানুষের সাথে মানুষের, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য আকাশ পাতাল। কিছু মানুষ রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচে জীবনযাপন করে, ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, আবার কিছু মানুষ পাহাড় পরিমাণ সম্পদের মালিক হোয়ে অকল্পনীয় ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করে। এদিকে অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সারা দুনিয়াব্যাপী চোলছে দাঙ্গা, বিক্ষোভ, সহিংসতা। এই হোচ্ছে এক নজরে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্যদীন ঐ সমাজে এমন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোরেছিল যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। এটি ইতিহাস। মানবরচিত কোন জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নি। সুতরাং বর্তমান মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যত প্রকল্পই হাতে নেওয়া হোক **যতদিন সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকবে ততদিন কেউ এই দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অবিচার দূর কোরতে পারবে না।**

৫. নৈতিক অবস্থা:

মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত কেবল দেহসর্বস্ব, ভোগসর্বস্ব প্রাণী নয়। তার ভিতরে আছে আল্লাহর রূহ, আল্লাহর আত্মা, এজন্য মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। যখন আল্লাহর এসলাম অর্ধ-পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের প্রতিটি মানুষ আল্লাহকে ভয় পেত। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, পরোপকার, মেহমানদারি, উদারতা, ত্যাগ, দানশীলতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হোয়ে গিয়েছিল। মোসলেমদের ওয়াদার মূল্য ছিল তাদের জীবনের চেয়েও বেশী। এটা হোয়েছিল আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমের কারণে। কেননা আল্লাহর সিস্টেম কেবল মানবসমাজের বাহিরের দিকগুলি (অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, প্রশাসন ইত্যাদি) নিয়েই কাজ করে না, এটি মানুষের চরিত্রকেও গড়ে তোলে আল্লাহর গুণাবলীর আলোকে। ফলে প্রতিটি মানুষ হোয়ে যায় সত্যের প্রতিমূর্তি। তাই

সে সমাজে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কথা কেউ কল্পনাও কোরবে না, অন্যের সম্পদে হাত দিতে প্রভুর ভয়ে তারা তটস্থ থাকবে।

পক্ষান্তরে মানবসৃষ্ট আল্লাহ-হীন জীবনব্যবস্থাগুলি মানুষের কেবল বাহ্যিক দিকগুলি নিয়ে কাজ করে। ফলে মানুষ হোয়ে যায় আত্মাহীন জানোয়ার। সে পশুর মতই কেবল আহার-বিহার-সম্ভোগে লিপ্ত থাকে, আরও বেশী অর্থ উপার্জন এবং আরও বেশী ভোগ করাকেই মানবজন্মের উদ্দেশ্য, স্বার্থকতা ও পরম প্রাপ্তি বোলে মনে করে। এসব অর্জনের পথে নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই থাকে না, তাই চলমান সিস্টেমগুলি খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলীকে অসদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম, যারা ধর্মগুরু তাদের নৈতিক অধঃপতন মানবজাতির জন্য অশনী সঙ্কেত। যে খ্রিস্টানরা সামরিক শক্তিবলে দুনিয়া দখল কোরে এখন মানবজাতিকে ‘সভ্য’ করার ঠিকাদারি গ্রহণ কোরেছে, সেই খ্রিস্টানদের ধর্মগুরুদের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র দেখে বিস্ময়ে হতবাক হোয়ে যেতে হয়। যে অভিযোগটি খ্রীস্টানদের উচ্চমার্গের ধর্মনেতা যথা কার্ডিনাল, বিশপদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে উত্থাপিত হোয়ে থাকে তা হোল শিশুদের উপর যৌন নিপীড়ন (Child Molestation) ও সমকামীতা। যারা বিশ্বের কিছুমাত্র খবরও রাখেন তাদের কাছে এ সংবাদ অতি পরিচিত। অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির যাযক, পুরোহিত সম্প্রদায়ও এ জাতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত নন। তবে সবচেয়ে ঘৃণ্য অবস্থা এই মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যার আলেমদের। নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীন অথবা বিরোধী শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তারা মুহূর্তে মুহূর্তে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া পরিবর্তন করেন। ধর্মকে বিক্রী কোরে টাকা উপার্জন করেন, অথচ ধর্মব্যবসা সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ। টাকার জন্য হালালকে হারাম- হারামকে হালাল কোরতে এইসব ধর্মজীবি আলেম ওলামাদের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। **আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হোলে আবার আত্মাহীন বস্তুবাদী মানুষগুলির মধ্যে নৈতিকতার বোধ সঞ্চারিত হবে,** কেউ নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য অন্যের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি কোরবে না।

৬. জাতীয় ঐক্য:

স্রষ্টা প্রাকৃতিক নিয়মে ঠিক কোরেছেন যে, ঐক্য অনৈক্যের উপরে জয়ী হবে। দশজন ঐক্যবদ্ধ লোক একশত জন ঐক্যহীন লোকের তুলনায় শক্তিশালী হবে, তাদের উপরে বিজয়ী হবে। তাই প্রকৃত এসলামের যারা অনুসারী তারা নিজ জাতির ঐক্য রক্ষাকে সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে মনে কোরবে। ঐক্য নষ্ট হয় এমন কথা বা কাজ তাদের কারো দ্বারা হবে না। কারণ মহানবী (দ:) বোলেছেন, ঐক্য নষ্ট করা কুফর অর্থাৎ ঐক্য নষ্টকারী উম্মাহ থেকেই বহিষ্কার। কারো পেছনে কেউ গীবত কোরবে না, কেউ ভুল করলে তার সামনে তাকে (সংশোধনের জন্য) বলা হবে।

গত কয়েক শতাব্দী ধোরে এই জাতি কেবলমাত্র বিভক্তই নয়, নিজেরা নিজেরা দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত রোয়েছে। এই কাজ কোরে তারা এসলাম থেকে বহিষ্কৃত তো হোয়েছেই, পুরো জাতিটিকে অন্য জাতির গোলামে পরিণত কোরেছে। কারণ ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম- United we stand, divide we fall অর্থাৎ ঐক্যতে বিজয়, অনৈক্যে পতন। পতনের পরিণতিতে সেই যে গোলাম হোল, গোলামী আজও চোলছে। আজ এই জাতির যাবতীয় অনগ্রসরতার, পশ্চাদপদতার, হীনমন্যতার, দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ এই অনৈক্য। এককালে যারা সমগ্র পৃথিবীতে একক সামরিক পরাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল, মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, শিক্ষকের আসন অধিকার কোরেছিল সেই মোসলেম জাতিটি আজ দুনিয়ার অন্যান্য পরাশক্তিগুলির করুণার পাত্র। আল্লাহর দেওয়া দীন প্রাকৃতিক আর প্রাকৃতিক নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। তাই **আজও যদি এই জাতিকে হারানো গৌরব ফিরে পেতে হয়, তাদেরকে সেই প্রাকৃতিক নিয়মটিই কাজে লাগাতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হোচ্ছে, 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারও হুকুম মানবো না' এই কথার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।**

বর্তমানের মানবরচিত প্রতিটি সিস্টেমেই জাতির ঐক্যের সকল পথ একটা একটা কোরে বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছে। যেমন গণতান্ত্রিক অধিকাংশ দেশেই সরকারী দল-বিরোধী দল পরস্পর যুদ্ধংদেহী অবস্থানে থাকে। কোন বিষয়েই তারা একমত হন না। একে অপরের চরিত্রহনন ও মুণ্ডুপাতকেই একমাত্র দায়িত্ব বোলে মনে করেন। গণতন্ত্র আছে বহুরকম, সমাজতন্ত্রও আছে অনেক

প্রকারের। প্রতিটি মতবাদের সমর্থনে আছে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল। এই সব দলের মধ্যেও থাকে নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে সৃষ্টি হওয়া উপদল। **ধর্মকে ব্যবহার কোরে যারা প্রচলিত সিস্টেমের রাজনীতি করে তাদের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ।** জাতীয় পর্যায়ে দলগুলির হানাহানি সঞ্চারিত হয় গ্রামাঞ্চলে, ফলে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে শহরে যেমন ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা তেমন অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গ্রামে গ্রামে শুরু হয় দাঙ্গা, সংঘর্ষ। এটা বর্তমান রাজনৈতিক দলাদলির একটা ফল মাত্র। সুতরাং চলমান সিস্টেমে বিভক্তি, দ্বন্দ্ব একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু এসলামে জাতি ছিল ইস্পাতের মত কঠিন ঐক্যবদ্ধ। সমগ্র জাতি ছিল একটি জাতি, তাদের নেতা (এমাম) ছিলেন একজন, দীন (জীবনব্যবস্থা) ছিল একটি- আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন। একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হোল জাতির একজন অবিসংবাদিত নেতা থাকবেন যিনি হবেন আল্লাহর প্রতিটি হুকুম বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনড়। সেই নেতার আদেশ জাতি বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় পালন কোরবে। তখন প্রাকৃতিকভাবেই সে জাতি শক্তিশালী হবে এবং সর্বত্র শান্তি বিরাজ কোরবে।

৭. শিক্ষা:

বেশিদিন আগের কথা নয়, ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদেরকে অপরিসীম শ্রদ্ধা কোরত, পায়ে হাত দিয়ে সালাম কোরত। সেখানে আজকের অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষকদেরকে ভক্তি করে না, স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকুও প্রায় বিলুপ্তির পথে। শিক্ষা আজ বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হোয়েছে যা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য কিনে থাকেন। বাণিজ্যিক লেনদেনে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসার কোন স্থান থাকে না, আত্মা থাকে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাই। বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদেরকে রাস্তায় বসে অনশন কোরতে হয়, কাফনের কাপড় পরে মিছিল কোরতে হয় সবশেষে পুলিসের পিটুনি খেয়ে, টিয়ার গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হোয়ে চোখের পানি ফেলে বাড়ি ফিরতে হয়।

পক্ষান্তরে **প্রকৃত এসলাম যখন ছিল তখন শিক্ষক মানুষকে শিক্ষা দিতেন আল্লাহর এবাদত মনে কোরে।** তিনি তার লব্ধ জ্ঞানকে অপরকে শিক্ষা দেওয়া মানবজাতির প্রতি নিজের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা (Duty and Responsibility) বোলে মনে কোরতেন। শিক্ষকের সম্মান

কেমন ছিল তা জানা যায় মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি ঘটনা থেকে। যে সময়ের কথা বোলছি, তখন কিন্তু প্রকৃত এসলাম ছিল না, প্রকৃত এসলাম হারিয়ে গেছে রসুলাল্লাহর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পরেই। প্রকৃত এসলাম না থাকলেও আল্লাহর আইন-কানুন মোটামুটি জাতীয়ভাবে মানা হোত। তখন এসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার একটি নমুনা উল্লেখ কোরছি। সম্রাট আওরঙ্গজেব একদিন তার পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা কেমন হোচ্ছে তা নিজ চোখে দেখতে যান। তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন তার পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর শিক্ষক নিজ হাত দিয়ে নিজের পায়ের ধূলা-ময়লা পরিষ্কার কোরছেন। এ দৃশ্য দেখে পরদিন তিনি শিক্ষককে নিজের নিকট ডেকে পাঠান। তিনি শিক্ষকের কাছে আক্ষেপ প্রকাশ কোরে বলেন যে, তার পুত্র তো আদব কায়দা, গুরুজনদের সম্মান করা কিছুই শেখে নি। কারণ শাহজাদা যদি শিক্ষকের পদযুগল নিজের হাত বুলিয়ে পরিষ্কার কোরে দিত তাহোলেই তার পুত্র সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হোচ্ছে বোলে তৃপ্ত হোতে পারতেন। শিক্ষাগুরুর এই সম্মান এক সময় আমাদের সমাজেও ছিল যা এখন কেবলই ইতিহাস। কারণ আল্লাহ-হীন শিক্ষাব্যবস্থা বা সিস্টেম সব মানুষকে এমন কোরে দিয়েছে।

৮. শিল্প ও সংস্কৃতি:

নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য নির্মাণ যেগুলি অশ্লীলতামুক্ত এবং মানবকল্যাণে সৃজিত সেগুলিসহ সকল প্রকার শিল্পে, সাহিত্যে, নতুন নতুন আবিষ্কারে মোসলেমরা সে সময় পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে উন্নীত হোয়েছিলেন। অথচ এখন এসব কাজকে ধর্মজীবি আলেম মুফতি শ্রেণী মনগড়া ফতোয়া দিয়ে হারাম কোরে রেখেছেন। এসলামের সরল নীতি হোল, বৈধ-অবৈধ নির্দ্ধারণের বেলায় মানদণ্ড হোচ্ছে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ অর্থাৎ আল-কোর'আন। রসুলাল্লাহ জানতেন যে, তাঁর বাণীকে ভবিষ্যতে বিকৃত করা হবে, অনেক বৈধ বিষয়কে অবৈধ ঘোষণার জন্য সেটিকে তাঁর উক্তি বোলে চালিয়ে দেওয়া হবে, তাই তিনি বোলে গেছেন, আমি তোমাদের জন্য সেটাই হালাল কোরেছি যেটা আল্লাহ হালাল কোরেছেন, সেটাই হারাম কোরেছি যেটা আল্লাহ হারাম কোরেছেন। তিনি আরও বলেন, আমার কোন কথা কোর'আনের বিধানকে রদ কোরবে না, তবে কোর'আনের বিধান আমার কথাকে রদ কোরবে (হাদীস)। সুতরাং যে কোন জিনিস হারাম কিনা তা জানার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কেতাব দেখতে হবে। কোর'আনে যা

কিছু নিষিদ্ধ করা হোয়েছে সেগুলি ছাড়া আর সবই বৈধ। এখন কোর'আনে দেখুন গান, বাদ্যযন্ত্র, কবিতা, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য নির্মাণ ইত্যাদি আল্লাহ হারাম কোরেছেন কিনা? যদি না কোরে থাকেন তাহোলে এগুলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। **আল্লাহ যেটিকে বৈধ কোরেছেন, সেটিকে কোন আলেম, মুফতি, ফকীহ, মোফাসসের হারাম করার অধিকার রাখেন না।** এ তো গেল সংস্কৃতির কথা। যে শিল্প মানুষের কল্যাণে আসে, মানুষের মেধার ইতিবাচক বিকাশ ঘটায়ে সেই শিল্পচর্চার পথ এসলাম রুদ্ধ তো করেই না, বরং উৎসাহিত করে।

৯. নারীজাতির অবস্থা:

মানবজাতির প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। আমাদের সমাজে এই নারীরা সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান একটি কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু প্রকৃত এসলামে নারীকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হোয়েছে সেটা মানবসৃষ্ট কোন ব্যবস্থাতেই দেওয়া হয় নি। কিন্তু এসলামের অন্যান্য সকল দিক যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি নারীর সম্পর্কে এসলামের সঠিক আকীদাও হারিয়ে গেছে। আজকে এসলামের প্রতিটা দিক বিপরীত। সত্য এসলামের নারী কেমন ছিল সেটা আজকের মানুষ কল্পনাও কোরতে পারে না। পরহেজগার নারী বোলতেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত একজন নারী, যার সাত চড়েও কোন রা নেই। সে এতই অবলা, সরলা যে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড় কোরিয়ে দিলে বাড়ি ফিরে আসতে পারে না, ঐখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে, স্বামীর সহায়তা ছাড়া সে এক কদমও চোলতে পারে না, বাস থেকে নামতে পারে না, নিজের পোশাকের সঙ্গে আটকে যখন তখন হোঁচট খায়। এই নারীমূর্তি দেখেই মানুষ ভাবছে এসলাম নারীকে বুঝি এভাবেই অথর্ব, জড়বুদ্ধি, অচল, বিড়ম্বিত কোরেই রাখতে চায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এসলামে মেয়েদেরকে আবদ্ধ কোরে রাখারই কোন সুযোগ নেই। আল্লাহর শেষ রসুলের (সা:) সময়ে নারীরা জাতির প্রয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন কোরেছেন। যেমন:

১. নারীরা মহানবীর সামনা সামনি বসে আলোচনা শুনতেন, শিক্ষা গ্রহণ কোরতেন, মহানবীকে প্রশ্ন কোরে জরুরী বিষয় জেনে নিতেন, অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও দিতেন। এ সময় মহানবী ও মেয়েদের মাঝে কোনো কাপড় টাঙ্গানো ছিল এই ব্যাপারে কেউ কোনো দলিল দেখাতে পারবে না।

২. নারীরা মহানবীর (দ:) সাথে থেকে যুদ্ধ কোরেছেন, শত্রুদের হামলা কোরেছেন, আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, নিহতদের দাফনে সহায়তা কোরেছেন। ওহুদের যুদ্ধে রসুলাল্লাহ যখন সাংঘাতিক আহত হন, তখন কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে রসুলাল্লাহকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার জন্য তলোয়ার হাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন উম্মে আম্মারা (রা:)। পরবর্তীতে রসুলাল্লাহ বোলেছিলেন, ওহুদের দিন যেদিকে তাকাই কেবল উম্মে আম্মারাকেই (রা:) দেখতে পেয়েছি।" যে যোদ্ধাদেরকে তারা চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছেন তারা কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন আলেমদের ভাষায় "বেগানা পুরুষ"। মসজিদে নববীর এক পাশে তৈরী করা হোয়েছিল যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই বিশেষ চিকিৎসা ইউনিটে অধ্যক্ষ ছিলেন একজন নারী, রুফায়দাহ (রা:)।

পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ, আজকে যাদের জীবনব্যবস্থা দিয়ে দুনিয়া চলে তারা নারীদেরকে ভোটের অধিকার দিয়েছে ১৯২৮ সনে, এখনও একশ বছরও হয় নি। তারা সেনাবাহিনীতে মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত কোরেছে তারও একশ বছর হয় নি। যুদ্ধাহতদের সেবা দেওয়ার জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে নার্সিং জগতে প্রায় দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়, তাকে আধুনিক নার্সিং-এর পুরোধা বলা হয়, কিন্তু ১৪০০ বছর আগের রুফায়দাহর (রা:) কথা এই এ জাতিকে ভুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে, ধর্মব্যবসায়ী কুপমণ্ডুক মোল্লাদের অপপ্রচারে প্রভাবিত এই জাতির লোকেরা মনে করে পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা এসে নারীজাতিকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে ধর্মীয় অন্ধত্ব, পশ্চাদপদতা ও অশিক্ষার কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে। কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

৩. নারীরা মহানবীর (দ:) সময় যুদ্ধ চলাকালীন সৈন্যদের খাবার, পানীয় ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ কোরেছেন।

৪. মেয়েরা মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে, জুম'আর সালাতে, দুই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ কোরত। প্রকৃত এসলামের জুমা কিন্তু বর্তমানের মত মৃত জুমা নয়, সেই জুমা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের অংশ।

৫. তারা পুরুষের সঙ্গেই হজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কোরত, যেটা এখনও চালু আছে; যেখানে অত্যন্ত ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির মধ্যে তাদেরকে হজ্ব কোরতে হয়। মনে রাখতে হবে, সেই হজ্ব কিন্তু বর্তমানের বিকৃত আকীদার শুধু আধ্যাত্মিক সফর বা তীর্থযাত্রা ছিল না, সেটা ছিল উম্মাহর বাৎসরিক মহা-সম্মেলন। সেখানে একত্র হোয়ে জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি বিষয়ে সর্বরকম সমস্যা, নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হোত। হজ্ব ছিল একটি মহাজাতিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখার একটি সুন্দর প্রক্রিয়া।

৬. তারা কৃষিকাজে, শিল্পকার্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ কোরেছে। মেয়েদের জাতীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিবরণ লিখতে গেলে কয়েক খণ্ডের বড় বড় বই হোয়ে যাবে।

মূল কথা হোচ্ছে, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিপদসঙ্কুল এবং সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি নারী সাহাবীরা অংশ নিয়েছেন, সেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য কাজে যে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা কখনই পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। আবার পরবর্তীতেও এসলামের স্বর্ণযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার লাভে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাই। সুতরাং আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হোলে নারীরা পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে যে কোন ভূমিকা রাখতে পারবে।

১০. শ্রম ব্যবস্থা:

শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরে জোর কোরে তাদের থেকে শ্রম আদায় করার ইতিহাস মানব সভ্যতায় বহুল আলোচিত। এই নির্যাতিত শ্রমজীবি মানুষগুলি তখনই মুক্তি পেয়েছে যখন আল্লাহর কোন নবী-রসুলের দ্বারা ঐ সমাজে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম হোয়েছে। অতীতকালে এই শ্রমিকদেরকে বলা হোত দাস, গোলাম। এখন দাসের বদলে শ্রমিক, কর্মী এবং

এমন আরও সুন্দর সুন্দর সুশীল শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুন্দর শব্দের অন্তরালে এখনও সেই ক্রীতদাসের নিপীড়িত অভিব্যক্তিই দেখা যায়। এমনকি বর্তমানের অবস্থা আরও ভয়াবহ, কারণ দাসপ্রথায় মনিব ক্রীতদাসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ কোরত আর আজ নাম মাত্র মজুরিতে শ্রমিক ভাড়া কোরে তার শ্রম ক্রয় করা হয়, কিন্তু আর কোন দায় দায়িত্বই নেওয়া হয় না। শ্রমিকদের ব্যাপারে রসুলাল্লাহর হুকুম হোচ্ছে, শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও। এটা রসুলাল্লাহর কেবল উপদেশবাণী নয়, এটা ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম, নির্দেশ যা উম্মাহ কিভাবে বাস্তবায়ন কোরেছে তা ইতিহাস। রসুলাল্লাহ বোলেছেন, 'তোমাদের গোলাম তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হোয়ে তোমাদের অধীন হোয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিৎ, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পোরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় না করে।' প্রত্যেক মোসলেম তাই তার অধীনস্থ ব্যক্তিকে তাকে নিজের ভাই জ্ঞান কোরতেন। ওমর (রা:) নিজে যেরুযালেম যাওয়ার সময় অর্ধেক পথ নিজে উটে আরোহণ কোরেছেন, বাকি অর্ধেক পথ নিজের দাসকে উটে আরোহণ কোরিয়ে নিজে উটের রশি টেনে নিয়ে গেছেন। সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে খলিফার সঙ্গে কোন দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রয়োজন পড়ে নি। এমন একটি অবস্থা কি আজ কল্পনা করা যায়? সেই সমাজ দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্যদীন।

শ্রমিকদের বঞ্চিত কোরে মালিকরাও যে খুব সুখে আছে তেমন কিন্তু নয়। এটা সত্য যে তারা তাদের পরিবার নিয়ে সীমাহীন ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেন। কিন্তু সুখ, শান্তি (Peace and happiness) আর ভোগবিলাস, আরাম আয়েশ (Comfort and enjoyment) কখনও এক জিনিস নয়। সুখ হোচ্ছে মানুষের দুঃশ্চিন্তাহীন, আতঙ্কহীন, হতাশাহীন একটি অবস্থা। মালিকপক্ষের যে কাউকে জিজ্ঞেস কোরে দেখুন তারাও শ্রমিকদের চেয়ে খুব একটা সুখে নেই। কারণ ব্যাংকের ঋণ, চাঁদাবাজি, আমদানী-রফতানীর সীমাহীন জটিলতা, সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘুষ দিয়ে খুশি রাখা, শ্রমিক বিক্ষোভ, বাজারদরের অনিয়ন্ত্রিত উত্থান-পতন বহুকিছু নিয়ে তারা মারাত্মক অসুখী জীবনযাপন করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমানের সিস্টেমগুলি কাউকেই সুখী কোরতে পারছে না, মালিককেও না, শ্রমিককেও না। তাই এই ক্ষতিকর সিস্টেমকে এখনই বর্জন করা সময়ের দাবি।

১১. পারিবারিক শৃঙ্খলা:

ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা'-কে সবচেয়ে বেশী চর্চা কোরছে পশ্চিমা দেশগুলি। তাদের হাতেই দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ, তাদেরকেই অনুকরণ করার চেষ্টা কোরছে বাকি পৃথিবী। এই অনুকরণ চোলছে পারিবারিক জীবনেও। পশ্চিমা দেশগুলিতে যৌথ পরিবার প্রথা বহু আগেই শেষ হোয়ে গেছে। তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের পুরুষরাও স্বনির্ভর হোতে না হোতেই নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা পরিবার গঠন করে, মেয়েরাও চায় না বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ির সঙ্গে থাকতে। তাদের সন্তান বড় হয় কাজের লোকের কাছে, সময় কাটায় টিভি দেখে। ফলে স্বভাবতই মা-বাবার প্রতি শৈশবেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সান্নিধ্যে থেকে নৈতিক শিক্ষা লাভ না করায় তারা হোয়ে ওঠে অনেকাংশে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। আমাদের সমাজেও এখন যৌথ পরিবার খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উচ্চবিত্তরা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসন দিয়ে তাদের প্রতি আজন্ম ঋণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে, আর নিম্নবিত্তরা স্রেফ বাবা-মাকে ত্যাগ কোরছে। দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য বহু বৃদ্ধ পিতাকে রিক্সা চালাতে হোচ্ছে, বহু বৃদ্ধা মাকে অন্যের বাড়িতে কাজ কোরে, অথবা ভিক্ষা কোরে বেঁচে থাকার লড়াই কোরতে হোচ্ছে। এখন পশ্চিমা দেশগুলিতে দিনে দিনে বিয়ের প্রথাও হারিয়ে যেতে শুরু কোরেছে। তাদের থেকে আমাদের সমাজেও আমদানি হোচ্ছে লিভ টুগেদার, লিভ ইন ইত্যাদি। বিয়েকে সেকেলে আখ্যা দিয়ে একত্রে বসবাস কোরছে নর-নারী, যতদিন ভালো লাগে একসাথে থাকা, অতঃপর আলাদা হোয়ে যাওয়া; জন্তু জানোয়ারের মধ্যে অবশ্য এই প্রথা প্রচলিত আছে অনাদিকাল থেকেই। এই পাশবিক প্রথার ফলে সমাজে সৃষ্টি হোচ্ছে করুণ ভারসাম্যহীনতা। অসুস্থ, বৃদ্ধ, অক্ষম লোকদের দেখার কেউ না থাকায় তারা এক পর্যায়ে হোয়ে পড়ছে সমাজের বোঝা। অনেক রাষ্ট্র তাদেরকে কোনমতে জীবনধারণের জন্য বৃদ্ধাশ্রমের ভালবাসাহীন, নির্বান্ধব প্রকোষ্ঠে করে। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশে সে ব্যবস্থাটুকুও নেই।

এই অশান্তিময় পারিবারিক জীবন আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত থাকলে কেউ কল্পনাতেও আনতে পারতো না। কিছুদিন আগেও প্রতিটি পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে যে সম্মান করা হোত সেই শিক্ষা যে আল্লাহর তরফ থেকে বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে এসে মানবসমাজে আচরিত হোয়েছে এ কথা কেউ

অস্বীকার কোরতে পারবে না। কেবল সম্মানই করা হোত না, প্রত্যেকে সেই কর্তাব্যক্তির হুকুম পালন কোরত।

উপার্জনের সামর্থ্য না থাকলেও মুরব্বিরাই পরিবারের কর্তা ছিলেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারাই নিতেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সাধারণত পরিবারের সকলের এমনকি যারা গৃহকর্মী তাদের পরামর্শও শোনা হোত। পরিবারের মধ্যে যে কোন অনৈক্য, মনোমালিন্য ঘোটলে এই মুরব্বিদের মধ্যস্থতায় সঙ্গে সঙ্গেই ফায়সালা হোয়ে যেত। আজকের একক পরিবার ব্যবস্থায় মনোমালিন্য হোলে সেটা মেটানোর কোন পথ থাকে না। **যেহেতু এসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনের ব্যাপারেও পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে তাই সেই আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আল্লাহর সত্যদীনের কোন বিকল্প নেই।**

১২. মানব জাতির অবস্থা:

সমস্ত মানব জাতিই এসেছে এক বাবা-মা আদম-হাওয়া থেকে। সুতরাং সমস্ত মানব জাতি প্রকৃতপক্ষে এক জাতি। এই বিশ্বকে সৃষ্টি কোরেছেন আল্লাহ এবং তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ কোরেছেন। এই হিসাবে সমস্ত পৃথিবীই তার দেশ। সুতরাং একটি দেশের নাগরিক যেমন ঐ দেশের সর্বত্র অবাধে বিচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদি ও বসবাস কোরতে পারে, তেমনি কোরে **সারা পৃথিবীতেই অবাধে বিচরণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিবাহ ও বসবাস কোরতে পারা তার জন্মগত অধিকার। এই অধিকার বর্তমানের সিস্টেম হরণ কোরে নিয়েছে।** ১৪০০ বছর আগে যে অর্ধ-পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল ঐ এলাকায় ভ্রমণ বা বসবাস কোরতে কোনই ভিসা-পাসপোর্ট-নাগরিকত্ব সনদ ইত্যাদি কিছুই লাগতো না। আজকে সিস্টেমের (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি মানব রচিত তন্ত্রের) ফাঁদে পড়ে সমস্ত পৃথিবী দুই শতাধিক ভৌগলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিছু রাষ্ট্রে জনসংখ্যার এমন বিস্ফোরণ ঘোটেছে যে অল্প স্থানে অসংখ্য মানুষ আটকে থাকতে বাধ্য হোচ্ছে। সেখানে জনসংখ্যার চাপে কৃত্রিমভাবে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হোয়েছে। অপর দিকে কিছু রাষ্ট্রে হাজার হাজার মাইল জায়গা পড়ে আছে বসবাসের মানুষ নেই। এ এক সাংঘাতিক অবিচার।

১৩. পোশাক:

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে পুরুষদেরকে আরবীয় জোব্বা পরিধান কোরতে হবে, মেয়েদেরকে আপাদমস্তক ঢাকা বোরকা পরিধান কোরতে হবে। পৃথিবীর একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ধরনের পোশাক পরে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু, ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি একটি এলাকার মানুষের পোশাক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **এসলাম যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর জন্য এসেছে তাই এর কোন নির্দিষ্ট পোশাক থাকা সম্ভবও নয়।** শুধু একটি মাত্র শর্ত আল্লাহ দিয়েছেন তা হোল- পোশাক যেন শালীনতা পরিপন্থী না হয়। অশালীন পোশাক পরিধান করা নিশ্চয় কোন ধর্মমতেই অনুমোদিত নয়, কোন সভ্য সমাজেই অশালীন পোশাক পরিধান মর্যাদাপূর্ণ হোতে পারে না। সকল ধর্মের শিক্ষা অশালীন পোশাক পরিধানের ফলে মানুষের যে নৈতিক অবনতি হয়, এই সরল সত্যটি বুঝতে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির অনেক মূল্য দিতে হোয়েছে। অতঃপর অনেকেই তাদের দেশের স্কুল কলেজে অশালীন পোশাক (যেমন মিনিস্কার্ট ইত্যাদি) পরে যাওয়া নিষিদ্ধ কোরেছে।

১৪. অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা:

উম্মতে মোহাম্মদী যত যুদ্ধ কোরেছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রশক্তি অধিকার কোরে সেখানে আল্লাহর বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ কোরে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোন অসুবিধা পর্যন্ত না কোরতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকজনের নিরাপত্তার যে ইতিহাস এই জাতি সৃষ্টি কোরেছে তা মানব জাতির ইতিহাসে অনন্য, একক, পৃথিবীর কোন জাতি তা কোরতে পারে নি। মানুষের সামষ্টিক জীবনের সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা নির্ভর করে সর্বক্ষেত্রে সঠিক আইন ও তার প্রয়োগের উপর। সুতরাং **মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম পরিবর্তন করা এসলামের উদ্দেশ্য নয়, এসলামের মূল উদ্দেশ্য সামষ্টিক জীবনে ন্যায়-সুবিচার-শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।** এরপর এসলামের ফল দেখে, সৌন্দর্য দেখে যারা তাদের ব্যক্তিগত

ধর্ম পরিবর্তন কোরে এসলাম গ্রহণ কোরতে চায় কোরবে, এটা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। এটাই আল্লাহর সত্যদীনের চিরন্তন নীতি। এর অকাট্য প্রমাণ ভারতবর্ষে প্রায় এক হাজার বছর মোসলেম শাসকরা শাসন কোরেছেন। যদি হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরকরণে বাধ্য করা হোত, ভারতবর্ষে একটি হিন্দু পরিবারেরও থাকার কথা ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা কি তাই? ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোসলেমের বহুগুণ বেশী। এসলামের স্বর্ণযুগে মধ্যপ্রাচ্যসহ অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে মোসলেম শাসিত এলাকায় ইহুদী-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস ছিল। যদি মোসলেমরা কাউকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য বাধ্য কোরত, তবে আজকের ইসরাইলে, সিরিয়া, লেবানন, মিশরে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে অন্যধর্মের কোন লোকই থাকতো না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানবজাতির আত্মা বহু আগেই অধঃপতিত, কলুষিত হোয়ে গেছে, বলা যায় প্রায় ধ্বংস হোয়ে গেছে। সততা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সচ্চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলী পাশ্চাত্য বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার প্রভাবে প্রায় ধ্বংস হোয়ে গেছে। সৎ মানুষ এ যুগে অচল পয়সার মত, এন্টিক মূল্য থাকলেও ব্যবহারিক মূল্য নেই। এ হোল মানবজাতির চারিত্রিক অধঃপতনের দিক। আর বাহ্যিকভাবে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, হানাহানি, হিংসা, রাজনৈতিক অস্থিরতা সব মিলিয়ে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকির বিষয়টি বিবেচনায় আনলে মানুষ ধ্বংসের একেবারে প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থা থেকে মানবজাতির বাঁচার উপায় কি সেটা আল্লাহ দয়া কোরে এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর প্রদত্ত সত্য জীবনব্যবস্থার সেই রূপরেখা মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বোলে মনে কোরছি।

যে এসলাম আপনারা আজকে ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা পুরোহিতদের কাছে দেখছেন আমরা সেই এসলামের কথা বোলছি না। এসলামের সত্যরূপ তাদের কাছে নেই। তারা কেউ হানাফি, কেউ হাম্বলি, কেউ শিয়া, কেউ সুন্নী, কেউ ওয়াহাবী, কেউ সালাফি, কেউ বাহায়ী। **তারা এই বিকৃত এবং অনেকাংশে মনগড়া এসলামগুলি শিক্ষা কোরেছেন ব্রিটিশ খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলি থেকে।** সুতরাং তাদের কাছে যে এসলাম আছে সেটা দিয়ে অমন শান্তির সমাজ

প্রতিষ্ঠা করার চিন্তাও হাস্যকর। আমরা বোলছি আল্লাহর সত্যদীন এসলামের কথা, যার রূপরেখা যামানার এমাম দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তায় বা তাঁর অসীম জ্ঞানের সম্বন্ধে যারা বিশ্বাসী নন তারা যুক্তি উত্থাপন কোরতে পারেন যে, চৌদ্দশ' বছর আগে মানুষ সমাজের যে অবস্থা ছিল সেখানে হয়তো এই জীবনব্যবস্থা কার্যকরী হোয়েছিল এবং ঐ অকল্পনীয় ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হোয়েছে তাতে জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হোয়েছে এখন ঐ পুরনো ব্যবস্থা আর সেরূপ ফল দেখাতে পারবে না; এখন মানুষকেই চিন্তাভাবনা কোরে তার জীবনব্যবস্থা তৈরী কোরে নিতে হবে এবং আমরা তা-ই নিচ্ছি। এ কথায় আমাদের জবাব হোচ্ছে, অবস্থার পারিপার্শ্বিকতায় বহু বিষয় বদলে যায়। অনেক বিষয় অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হোয়ে যায়। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, এর কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: একটি মানুষের নাকে সজোরে ঘুষি মারলে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হবে, লক্ষ বছর আগে এই ঘুষি মারলে তখনও রক্ত বের হোত, আজও বেরোয়, লক্ষ বছর পরেও মানুষের নাকে ঘুষি মারলে রক্ত বেরোবে। এর কোন পরিবর্তন নেই। জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক পূঁজিবাদ মনুষ্য সমাজে যে ক্ষতি করে, ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে তা লক্ষ বছর আগেও কোরত, এখনও কোরছে এবং আজ থেকে লক্ষ বছর পরেও এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবজীবনে প্রয়োগ কোরলে একই বিষময় ফল সৃষ্টি কোরবে। আগুনের পোড়াবার শক্তি লক্ষ বছর আগে যা ছিল, আজও তাই আছে এবং লক্ষ বছর পরেও অপরিবর্তনীয়ভাবে তা-ই থাকবে।

এমনি বহু জিনিস আছে যা শাশ্বত অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এই শেষ জীবনবিধান (দীন) তেমনি সেইসব অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন যা পৃথিবীর বাকী আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন হবে না। এই জন্য এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন (সূরা রুম ৩০)। **এই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐ সব অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন, যাতে মানবজাতির বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে।** স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনীয় যা কিছু ইতোপূর্বে প্রেরিত জীবনব্যবস্থাগুলিতে ছিল তার কোনটিই এতে স্থান পায় নাই, এতে শুধু

অপরিবর্তনীয় শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। কাজেই চৌদ্দশ' বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রয়োগে যে ফল হোয়েছিল, বর্তমানে প্রয়োগ কোরলেও সেই একই ফল হবে এবং লক্ষ বছর পরে প্রয়োগ কোরলেও সেই অকল্পনীয় ফলই হবে।

আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:) এর উপর অবতীর্ণ এই সত্যদীন আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মতই নিখুঁত ও অবিকৃত। আল্লাহর সৃষ্টি কেমন নিখুঁত, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোন খুঁত দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে (সূরা মুলক ৩/৪)। আল্লাহর দেওয়া সত্যদীনও এমনই নিখুঁত। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব মানুষের, তারা কি এভাবেই তাদের জীবন কাটিয়ে যাবে, এমন একটি নারকীয় পরিবেশে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রেখে যাবে নাকি, তাদেরকে একটি স্বর্গীয় জীবন উপহার দিয়ে যাবে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে এই নারকীয় সিস্টেমটাকে পাল্টাই। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহ-রসুলের হারিয়ে যাওয়া যে প্রকৃত, সত্য জীবনব্যবস্থা মানবজাতির সামনে তুলে ধোরেছেন তা গ্রহণ কোরি। অশান্তিময় জীবনকে শান্তিময় কোরি। এমন একটি জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম কায়েম কোরি যেখানে সুখ, শান্তি আর নিরাপত্তায় আনন্দময় জীবনযাপন কোরবে মানবজাতি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল এই সুখ-শান্তি কেবল পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা প্রলম্বিত হবে পরকাল পর্যন্ত। সেখানে তারা লাভ কোরবে অনন্ত জান্নাত।

আজ মহানবীর (দ:) উম্মত হিসাবে হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে সেই প্রকৃত এসলামকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান কোরে যাচ্ছে। এই সত্যদীন অনুসরণ কোরলে মানবজাতি যে সত্যিই শান্তি পাবে তার স্বাক্ষর আমরা ইতোমধ্যেই রেখেছি। বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলন কোরতে গিয়ে গণতন্ত্রের নামে মানুষের ক্ষতি করা, পথরোধ করা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হামলা করা, হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও পিকেটিং ইত্যাদি দুনিয়াময় চালু থাকলেও হেযবুত তওহীদ তার জন্মলগ্ন থেকে ১৮ বছর যাবৎ কারো কোন ক্ষতি না কোরে, কারো পথরোধ না কোরে, হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও

ইত্যাদি কোন ধ্বংসাত্মক কাজ না কোরে, মানুষকে একটুও কষ্ট না দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আইনশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে এর আদর্শ প্রচার কোরে যাচ্ছে। সুতরাং এভাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেও দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে নিজেদের আদর্শকে তুলে ধরা সম্ভব তার নজির স্থাপন কোরেছে হেযবুত তওহীদ। শুধু তাই নয়, হেযবুত তওহীদের কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবেও কোন অন্যায় করে না। তারা সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় আয়-উপার্জন করে, তারা সুদ ঘুষের সংস্পর্শে যায় না, তারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং কোন কাজকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে না। এটি আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার এমন এক আন্দোলন যা এর বাইরের কারো কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে মানবতার কল্যাণে কাজ কোরে যাচ্ছে। এই ১৮ বছরে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন দেশের কোন একটি আইনও ভঙ্গ করে নি, একটিও অপরাধ করে নি। এটি আল্লাহর সত্যদীনের ফল। পুরো মানবজাতি যদি এভাবে আল্লাহর সত্যদীনকে তাদের জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম হিসাবে বরণ কোরে নেয়, তবে তাদের জীবন থেকেও সর্বপ্রকার অন্যায়, অপরাধ এবং অশান্তি নির্মূল হোয়ে যাবে এনশা'আল্লাহ।

আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থা (দীনুল হক)

চলমান সঙ্কটে মুক্তির এশতেহার

আফ্রিকা থেকে শুরু কোরে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল দেশে আজ একটি অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ কোরছে। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, আন্দোলন, ভাংচুর, হরতাল, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হোচ্ছে। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়। ক্ষমতাসীন একটা সরকারকে প্রবল আন্দোলন, জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে টেনে হিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামানো হয়, আরেক দলকে ক্ষমতায় বসানো হয়। তারা এসে আবার পূর্ববর্তী সরকারের মতই দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার ইত্যাদি কোরতে থাকে। সরকারের বিরুদ্ধবাদীর উপর চলে দমন পীড়ন আর পর্দার অন্তরালে চলে বৈদেশিক প্রভুদের তাবেদারির প্রতিযোগিতা। চলমান এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখে দেখে মানুষ বিরক্ত, হতাশ। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তম বিকল্প নেই। তাই তারা একবার কড়াই থেকে চুলায় লাফিয়ে পড়ছে, আবার বাঁচার জন্য লাফিয়ে কড়াইতে উঠছে। এতে কোরে দিনে দিনে মানুষের যন্ত্রণা বাড়ছে এবং বাড়বে।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা ছিল এসলাম-পূর্ব আরবের। আরবের গোত্রগুলির মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধেই চোলত, যা পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকতো। এই শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলিই যখন আল্লাহর রসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোল, তখন তারা হোয়ে গেল বিশ্বজয়ী একটি জাতি। প্রায় নিরক্ষর আরবদের থেকে এমন একটি জাতির উন্মেষ ঘোটল যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোল। বাকি দুনিয়া সভয়-সম্ভ্রমে তাদের দিকে চেয়ে থাকতো। রসুলাল্লাহর আনীত আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলোকে ভাই বানিয়ে ফেললো। আত্মিক উন্নতির ফলে প্রতিটি মানুষ একেকজন সোনার মানুষে রূপান্তরিত হোয়ে গেলেন। চুরি, ডাকাতি প্রায় বন্ধ হোয়ে গেল। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য দূর হোয়ে সমাজে সমৃদ্ধি আসলো। আজ আমরা রসুলাল্লাহর যে সাহাবীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে জানি, তাঁরা এসলাম গ্রহণের আগেও কি এমনই ছিলেন? না। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঠিক তাঁরাই একেকজন মহামানবে পরিণত হন। আজও আমরা তাদের নামের পরে বোলি 'রাদি আল্লাহু আনহুম' অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি, খুশি।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদেরকে সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে আল্লাহর দেওয়া সেই অপরূপ, নিখুঁত সিস্টেমটি। তাই মানবজাতির প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, আমরা বার বার ব্যক্তিকে পাল্টানোর চিন্তা না কোরে সিস্টেমটাই পাল্টাই। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই পারে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারের সব পথ বন্ধ কোরে দিতে। সেই সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে আজকের ঘুঁণে ধরা সমাজের অসৎ মানুষগুলিই একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হবে এনশা'আল্লাহ।

(০৫.০৮.২০১৩)

প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
৩১-৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল# ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫
ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.com

মূল্য ২০ টাকা